ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের

পাণ্ডব গোয়েন্দা

দাসনগর রহস্য

অষ্টম অভিযান

দাসনগর রহস্য

হাওড়া দাশনগরে জন্মাষ্টমীর বিখ্যাত মেলা দেখতে গিয়েছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। ভারী চমৎকার জায়গা। মেলাতলার পাশ দিয়ে পু-পা শাঁখ বাজিয়ে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে। তাই দেখে বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, রেল বাধের ওপারে যাবে? বসে বসে ট্রেন দেখব।" বাবলু বলল, "না। সন্ধে হয়ে গেছে। এ সময় ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। অনবরত ট্রেন যাচ্ছে আসছে, কখন কী হয় তার ঠিক কী?"

বাচ্চু বলল, "চলো না গো বাবলুদা। আমারও খুব ইচ্ছে ওখানে বসে ট্রেন দেখার।"

পঞ্চু নিজের মনে কুই কুই করতে লাগল।

বাবলু বলল, "কীরে ব্যাটা, তোরও কী ইচ্ছে নাকি?"

পঞ্চু এবার ডেকে উঠল, "ভৌ ভোঁ।"

বাবলু বলল, "এরও ইচ্ছে আছে দেখছি। চল তবে।"

ওরা সেই আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বি এন আর বাঁধের ওপর উঠল, তারপর লাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে একটু নিরাপদ জায়গা দেখে বসল।

এখান থেকে মেলাতলাটা কী আশ্চর্য রকমের সুন্দর দেখতে লাগছে। আলোর বন্যা বইছে যেন চারদিকে। অনবরত ট্রেন যাচ্ছে আসছে। কী ভালই না লাগছে। বিলু বলল, "আমরা এইখানে বেশ গুপী গাইনের গুপী আর বাঘার মতো ভূতের রাজার দেখা পেয়ে যেতাম?"

বাবলু বলল, "কী করতিস তা হলে?"

"বর চাইতাম!"

"কী বর চাইতিস?"

“আমরা যেন ইচ্ছে করলেই যত্রতত্র যেতে পারি। এই যেমন ধরো ইচ্ছে হল মস্কো যাবার, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম। চিন জাপান রোম ইতালি লন্ডন যখন খুশি তখনই চলে যেতে পারি।”

ভোম্বল বলল, “আমি হলে কী বর চাইতাম জনি?”

“কী করে জানব?”

“আমি তোরটা তো চাইতামই উপরন্তু আর একটা বর চাইতাম। যখন যা খুশি তাই যেন খেতে পারি। চাইবামাত্র দুনিয়ার ভাল ভাল খাবার সব যেন হাতের কাছে এসে হাজির হয়। আর যত চোর-ডাকাত আছে যাদের কেউ ধরতে পারবে না তাদের প্রত্যেককে আমরা যেন অনায়াসে ধরে ফেলতে পারি।”

এমন সময় হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। হইহই রব উঠল চারদিকে। লোডশেডিং। একটু আগে যেখানে আলোর বন্যা বইছিল এখন সেখানে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। বাবলু বলল, “সর্বনাশ হয়েছে। খুব সাবধানে আমাদের নেমে পড়তে হবে এখান থেকে।”

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, “হ্যাঁ। আর এখানে থাকা ঠিক নয়।”

ওরা আস্তে আস্তে মেলাতলার বাইরে রাস্তার দিকে নেমে এল। বাঁধের নীচেই হোগলার ছাউনি দেওয়া দরমা ঘেরা অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছিল কতকগুলো। একটা দোকানে ওরা ঢুকল। ঢুকেই দেখল রাম, শ্যাম, যদু আর মধু বসে আছে দোকানে।

মধুকে দেখে বাবলু বলল, “কী রে শিঙি মাছ, তুই এখানে?”

মধু রাগতস্বরে বলল, “খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু বাবলু।”

যদু বলল, “বাবলু তোকে শিঙিমাছ বলল আর তুই একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলি না ওকে? কী রে তুই?”

রাম বলল, “এখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার লাগিয়ে দাও না বাবলুদা?”

শ্যাম বলল, “অ্যাডভেঞ্চার কি জোর করে করা যায়? ঘটনা না হলে কেমন করে হবে?”

মধু বলল, “নাঃ, বাবলুর অসাধ্য কিছু নেই। ও যেখানে সেখানে রহস্যের গন্ধ পায়। বড় হয়ে শার্লক হোমস হবে।”

যদু বলল, “এখনই বা কম কী বাবা?”

বাবলু বলল, “কী সব বাজে বকবক করছিস? বেশিক্ষণ দোকানে বসে থাকলে চলে? খাবি দাবি কেটে পড়বি, এই তো জানি।”

দোকানটা ছোট। একজন মালিক, একজন কারিগর ও একজন বয়কে নিয়ে দোকান।

বয় এসে বলল, “কী খাবে দাদারা?”

বাবলু বলল, “মোগলাই পরোটা। গরম হবে তো?”

“এখনই করে দিচ্ছি।”

বাবলু ওদের বলল, “তোরা?”

“আমরাও। সেম সেম।”

বাবলু বলল, “ঠিক আছে। আমাদের সবাইকেই পরোটা দাও। প্রত্যেকের দাম আমিই দেব, বুঝেছ। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো–কুইক।”

রাম আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, “থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!”

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, “হিপ হিপ হুরর রে।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোগলাই পরোটা তৈরি করে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল বয়। ওরা মনের আনন্দে সেই গরম গরম মোগলাই পরোটা সবে খেতে যাবে এমন সময় হঠাৎ দোকানের সামনে দেখা গেল দুটা অতিকায় ছায়ামূর্তিকে।

লোডশেডিংয়ের জন্য বাইরেটা অন্ধকার থাকায় ওদের ঠিক চিনতে পারা গেল না। কিন্তু যারা চেনবার তারা ঠিক চিনতে পারল। বয়টা পাংশু মুখ করে

দাঁড়াল একপাশে। কারিগরটা বেড়ালের মতো জুলজুল চোখে চেয়ে রইল। আর দোকানের মালিক আতঙ্কিত চোখে তাকাল তাদের দিকে।

লোক দুটি বাইরে ছিল। এবার ভেতরে ঢুকতেই তাদের বেশ ভালভাবে দেখা গেল। উঃ! কী ভীষণ চেহারা। দুটো লোকই সমান মাথায়। পরনে ফুল প্যান্ট, গায়ে ডোরাকাটা নাইলনের গেঞ্জি। গলায় রুমাল বাঁধা। একজনের মাথায় টুপি, আর একজনের ন্যাড়া-মাথা। কদমছাট চুল। দুজনেই স্বাস্থ্যবান, বলবান। দু'জনেরই হাতে বালা। ঠিক যেন হিন্দি ছবির ভিলেন। মস্তান দি গ্রেট।

টুপি পরা মাস্তানটি দোকানে ঢুকেই সরাসরি মালিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তা কি ঠিক করলেন বৈকুণ্ঠবাবু?"

দোকানের মালিক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "এখনও কিছু ঠিক করিনি।"

"কবে ঠিক করবেন?"

"আজ্ঞে, কাল আপনাদের ফাইনাল কথা দেব।"

মস্তানটা ঝপ করে বৈকুণ্ঠবাবুর জামার কলার ধরে বলল, "এরকম কাল তো অনেক দেখলাম, আর কত কাল দেখাবে চাঁদু।"

"আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ। আমার ওপর এই অত্যাচার কেন?"

"অত্যাচার তো তুমি করাচ্ছ। আমাদের কথায় রাজি হলে তো এসব কিছু হত না।"

"কিন্তু আপনারা যা বলছেন তাতে কি রাজি হওয়া যায়?"

বৈকুণ্ঠবাবু কাচুমাচু হয়ে বললেন, "দোহাই আপনাদের। দয়া করে আমাকে আর একটা দিন সময় দিন।"

বাবলুরা যে-যার মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে তখন। ন্যাড়া-মাথা মস্তানটা সরাসরি এসে বাবলুদের খাবার টেবিলের ওপরে বসে পড়ল। বসে একটা চেয়ারের ওপর পা

তুলে রামের প্লেটটা কেড়ে নিয়ে ওর পরোটাটা খেতে শুরু করে দিল। রামের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। চোখে জল এসে গেল বেচারির।

বাবলু তখন রেগে লাল হয়ে উঠেছে। সে নিজের সিট ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল মস্তানটার কাছে। তারপর বলল, "এই ইডিয়ট, এটা কী হচ্ছে?"

"কী বললি?"

"যা বললুম তা তো বাংলা ভাষাতেই বললুম। একটা অবশ্য ইংরিজি কথা আছে, সেটার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস?"

মস্তানটা খাবার শুধু মুখেই পুরল। কিন্তু চিবোতে আর পারল না। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল বাবলুর দিকে। যাকে দেখলে আচ্ছা আচ্ছা বলবান লোকও ঘাবড়ে যায়, তার মতো একটা ভয়ংকর চেহারার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ওইটুকু একটা ছেলে যে কী করে গরম নিচ্ছে তা সে ভেবেই পেল না।

বিলু বলল, "আমরা এতক্ষণ ধরে বসে থেকে এগুলো তৈরি করালম আর তুমি ব্যাটা পায়ে পা তুলে খাবে? ও খাবার খেলেই তোমার কলেরা হবে। মুখ থেকে ফেলে দাও বলছি।"

বাবলু বলল, "একে আবার তুমি কী? তুই বল।"

মস্তানটার চোখ-মুখ তখন আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছে। চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকাল সে। বৈকুণ্ঠবাবু চাপা গলায় বললেন, "খোকাবাবুরা ওদের সঙ্গে ওইভাবে কথা বলে না। বাড়ি চলে যাও। ওরা সাংঘাতিক লোক।"

বাবলু বলল, "ওরা যে সাংঘাতিক লোক তা ওদের চেহারা আর কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারছি। আপনাকে বলে দিতে হবে না।"

বিলু আবার মস্তানটাকে বলল, "কী রে, ফেলবি না মুখ থেকে?"

ভোম্বল বলল, "ও তো ও, ওর বাবা ফেলবে।" বলেই থুথু করে এক ধ্যাবড়া থুথু ছিটিয়ে দিল লোকটার মুখে।"

আর যায় কোথা? খাওয়া তো গেল মাথায় উঠে। মস্তানটা রুমাল বের করে করে মুখের থুথু মুছে নিয়েই তার বর্জ্যমুষ্টিতে প্রবল বেগে একটি ঘুষি নিক্ষেপ করল ভোম্বলের মুখটাকে লক্ষ্য করে।

ভোম্বল তৈরিই ছিল। ঝুপ করে বসে পড়ল মাটিতে। আর পঞ্চু করল কী এক লাফে প্রাণপণে কামড়ে ধরল মস্তানের সেই বজ্রবাহু। বিলু তখন চকিতে ঘরের কোণ থেকে কাঠ চালানো কুড়ুলটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

বাবলু মস্তানটাকে বলল, "কী, কেমন লাগছে এবার? আমি না বলা পর্যন্ত ও হাত ও সহজে ছাড়ছে না।" তারপর সেই টুপিওলা মস্তানের কাছে গিয়ে বলল, "তা বন্ধুভাই, কদিন হচ্ছে এই সব ছ্যাচড়ামো?"

সে লোকটা উত্তর দেবে কী, ব্যাপার দেখে থ হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "এমন আঘাটায় এসে ফাঁসবে বলে আশাই করনি, না?"

টুপি পরা মস্তানটা বলল, "কে তোমরা?"

"তোমাদের যম।"

বাবলু বৈকুণ্ঠবাবুকে বলল, "আপনি বাইরে যান তো।"

কারিগর আর বয়টা বাবলুর দিকে অবাক চোখে চেয়ে ছিল। বাবলু তাদেরও বলল, "তোমরাও বাইরে যাও।" তারপর রাম, শ্যাম, যদু, মধুকেও বাইরে যেতে বলল বাবলু। বলল, "তোরাও বাইরে গিয়ে দাঁড়া। আমরা সবাই বাইরে গিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব ব্যাটাদের। ওরা জানে না কোথায় চার ফেলতে এসেছে।"

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "অমন কাজটি করো না খোকাবাবুরা। দোকানে আগুন দিলে আমার যে সর্বস্ব যাবে।"

বিলু বলল, "যায় যাবে। না হলে যে প্রাণে মরবেন, সে খেয়াল আছে? আমরা যা করি চুপচাপ দেখে যান।"

বাইরে তখন হাজার হাজার লোক ঘোরাফেরা করছে অন্ধকারে। অথচ এই ছোট্ট দোকানটার ভেতর কী কাণ্ডটা যে হয়ে যাচ্ছে তা কেউ জানে না।

সবাই দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে বাবলু টুপিওলা মস্তানটাকে বলল, "যাও, তুমিও তোমার ওই সঙ্গীর পাশে গিয়ে বসো।"

লোকটির ইতস্তত দেখে ভোম্বল বলল, "যা না ব্যাটা। এখুনি দেব কুড়ুলে করে কুপিয়ে।"

অগত্যা টুপিওলা মস্তান ন্যাড়-মাথা মস্তানের পাশে গিয়ে বসল।

বাবলু বলল, "হাত ওপরে ওঠাও।"

লোকটি হাত তুলল।

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চুু ছেড়ে দে এবার।"

ন্যাড়া-মাথা মস্তানের হাত তখন রক্তাক্ত। দাঁতের কামড়ে আর নখের অাঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত সে। পঞ্চু ছেড়ে দিতেই রুমালে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কটমট করে চোখ পাকাতে লাগল।

বাবলু বলল, "খবরদার। চোখ রাঙালে একেবারে শেষ করে ফেলব। দেখছ তো উনুনে গরম জল ফুটছে। এখনই ঢেলে দেব গায়ে। আর পালাবার চেষ্টা যদি করো তা হলে একটাই পথ। কুড়ুল হাতে যম দাড়িয়ে আছে। এখুনি কলাগাছ কোপানো করবে। তা ছাড়া কুকুর তো আছেই। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে একেবারে।"

টুপিওলা মস্তান বলল, "ঠিক আছে। আমাদের ছেড়ে দাও আমরা চলে যাচ্ছি।"

বিলু হো হো করে হেসে উঠে বলল, "এত সহজে?"

"কেন, কী করতে চাও তোমরা?"

"আমরা অনেক কিছুই করতে চাই। প্রথমেই তোমাদের কান ধরে ওঠবোস করাব।"

ন্যাড়া-মাথা বলল, “তোদের হুকুমে?”

ভোম্বল তখন এক লাফে সেই ফুটন্ত জল থেকে এক মগ জল নিয়ে এগিয়ে গেল।

টুপিওলা মস্তান ন্যাড়া-মাথাকে বলল, “বেগড়বাই করিস না। মহা ত্যাদড় ছেলে সব। এখুনি ঢেলে দেবে গায়ে।”

ন্যাড়া-মাথার বোধহয় একটু প্রেসটিজে লাগছিল এইসব ছোট ছেলেদের কথার বশ হতে। বলল “সব করবে ওরা।” শুধুমাত্র বলার অপেক্ষা। ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ছপাৎ করে ছুড়ে দিল মস্তানটার মুখে।

যেই না দেওয়া আমনি লাফিয়ে উঠল সে। তারপর এক লাফে একেবারে দরজার কাছে।

বিলুও তখন বলরাম হয়ে কুড়ুল হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, “খবরদার। মারব এক কোপ। দুনিয়ার কাউকে ডরাই না আমরা। পুলিশ পর্যন্ত আমাদের হাতে।”

পঞ্চুও তখন রাগে গরগর করছে।

অগত্যা পিছিয়ে যেতে হল তাকে। কিন্তু ততক্ষণে তার সারা মুখে মালপোর মতো বড় বড় বেশ কতকগুলো ফোস্কা পড়ে গেছে।

টুপিওলা মস্তান ন্যাড়া-মাথাকে ভৎসনা করে বলল, “কী হল কী? দেখছিস যখন ফাঁদে পড়েছি তখন কেন ঘটাতে গেলি এদে?”

তারপর বাবলুকে বলল, “ভাই, তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। তা হলে তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে এই রকম করছ?”

বাবলু বলল, “না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা যে নেই তা আমরাও স্বীকার করি। দোকানের মালিকের সঙ্গে যতক্ষণ তোমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল ততক্ষণ আমরা কেউ একটা কথাও বলেছি?”

“না”

বাবলু তখন ন্যাড়া-মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “কিন্তু এই বদটাই তো ঘটালো আমাদের ও কেন অযথা গা-জোয়ারি করে আমাদের খাবার খেতে গেল? কাজেই আমরা কী করে ছাড়ি তোমাদের? বিশেষ করে তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হল তোমরা এমন কিছু করতে চলেছে যা করতে এই দোকানদার বৈকুণ্ঠবাবু মোটেই ইচ্ছুক নন। কী সে কাজ জানি না। তবে কাজটা যে ভাল কাজ নয় তা জানি। কেন না তোমাদের মতো লোক কখনও ভাল কাজ করতে পারে না। দুর্বলের উপর অত্যাচার করাটা তোমাদের পেশা। তাই তোমরা আমাদের ওপরও জুলুম করতে এসেছিলে। কিন্তু তোমরা জানতে না যে আমরা এই কটি ছেলেমেয়ে তোমাদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তি রাখি। শক্তিটা অবশ্য শারীরিক নয়, বুদ্ধির। তার প্রমাণ পেলে তো? ইঁদুর যেমন জাতাকলে আটকায় ঠিক সেইভাবে আটকেছ তোমরা। হিম্মত থাকে তো আমাদের খপ্পর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়ে চলে যাও। যাক। এখন যা বলি তাই করো। বৃথা সময় নষ্ট করলে দু'পক্ষেরই ক্ষতি।”

“কী করতে হবে বলো?”

“ওই তো বললুম। দু'জনকে কান ধরে ওঠাবসা করতে হবে।”

বাবলুর আদেশ পালিত হল। দু’মস্তানে এ ওর কান ধরে ওঠাবসা করতে লাগল।

বিলু বলল, “গুণে গুণে একশোবার।”

বাচ্চু-বিচ্ছু মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

বাবলু বলল, “ঠিক আছে থাক। এবার প্যান্ট ছেড়ে শুধু গেঞ্জি আর আন্ডারপ্যান্ট পরে বাড়ি যাও।”

ন্যাড়া-মাথা বলল, “কী আবদার।”

টুপিওলা বলল, “তোমরা কী সাধারণ ভদ্রতাও শেখোনি?”

বাবলু বলল, “আমাদের শিক্ষা যথেষ্টই আছে। এখন যা করতে বলছি, তাই করো। প্যান্টদুটো থানায় জমা দেব। পুলিশের কাজে লাগবে।”

“পুলিশের?”

“হ্যাঁ। এখনই আমার বন্ধুরা গিয়ে পুলিশে খবর দিতে পারত। কিন্তু তা দেবে না। কেন না তোমাদের মতো বড় মাছ আমি একটু খেলিয়ে খেলিয়ে ধরতে ভালবাসি। প্যান্ট ছেড়ে ফেললেই তোমাদের মুক্তি! এখনও লোডশেডিং আছে। পালাতে অসুবিধে হবে না। ঘাঁটিটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি। সে আমরা খুঁজে বার করে নেব।”

“কিন্তু এর ভেতরে আমাদের অনেক দরকারি কাগজপত্তর, টাকা-পয়সা আছে। সেগুলো বার করে নিতে পারি তো?”

“না। আমরা বার করব। তোমরা পকেটে হাত দেবে না। কেন না দরকারি কাগজপত্তর ছাড়াও ওর ভেতরে হয়তো ছুরি রিভলভারও আছে।”

অগত্যা তারা দু’জনেই প্যান্ট খুলে দিল।

বাবলু টাকাপয়সা যা ছিল বার করে নিয়ে সব ওদের ফিরিয়ে দিল। শুধু প্যান্টদুটো ছাড়া। তাতে কাগজপত্তর তো ছিলই উপরন্তু স্প্রিং দেওয়া ছুরিও ছিল। বাবলু ওদের টাকা-পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “আচ্ছা ওকে। গুড নাইট।”

“গুড নাইট।”

ওরা দেখল সেই দু-দুজন ভয়ংকর চেহারার লোক রাতের অন্ধকারে পথে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বাবলু বলল, “খাওয়ার আমেজটাই মাটি করে দিল ব্যাটারা। অথচ এখন আর খাবার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। প্যান্টদুটো নিয়ে এখুনি কেটে পড়তে হবে আমাদের। তারপর বৈকুণ্ঠবাবুকে বলল, “নিন। আপনি দোকান চালান। আমরা যাই। একটু সাবধানে থাকবেন কিন্তু।”

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, “তা থাকব। কিন্তু কে বাবা তোমরা?”

বাবলু হেসে বলল, “পাণ্ডব গোয়েন্দা।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছি বটে নাম। তোমাদের নিয়ে লেখা অনেক গল্প পড়েছি।”

“আচ্ছা, চলি আমরা।”

“এসো বাবারা এসো। ওঃ যা খেল দেখালে তোমরা।”

বাবলুরা আর অপেক্ষা করল না। -

লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ওরাও চলল যে যার বাড়ির দিকে। ওদের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

কিছুটা পথ গিয়েই থেমে পড়ল বাবলু, “ এ হে। খুব ভুল হয়ে গেছে।”

“কী হল?”

“বৈকুণ্ঠবাবুর মুখ থেকে ওদের সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিয়ে এলে হত।”

বিলু বলল, “তাই তো। এটা মাথায় আসেনি।”

বাবলু বলল, “ঠিক আছে। তোরা যা। আমি খোঁজখবর নিয়ে একটু পরেই আসছি।”

“আমি যাব?”

“কোনও দরকার নেই।”

“দেখিস যদি দরকার হয়—”

“আরে পঞ্চু তো রয়েছে সঙ্গে।”

ওরা চলে গেল ।

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই দোকানে। বাবলুকে দেখে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, “কী ব্যাপার! আবার ফিরে এলে যে?” “আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।”

বৈকুণ্ঠবাবু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবলুর মুখোমুখি বসলেন। বললেন, “কী জানতে চাও বলো?”

“এই লোকগুলো কত দিন আপনাকে জ্বালাতন করছে?”

“বেশিদিন নয়।”

“আপনি ওদের চেনেন?”

“একেবারেই অচেনা।”

“কী চায় ওরা?”

“তাও জানি না। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ওরা এসে আবদার ধরল দোকানটা ওদের ছেড়ে দিতে হবে।”

“তারপর?”

“আমি রাজি হলাম না। তখন ওরা বলল, আমি যদি দোকান না ছাড়ি তা হলে ওরা যে সব মাল আমার দোকানে রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ওদের একজন লোকও সব সময় থাকবে আমার দোকানে।”

“ওদের ঘাঁটিটা কোথায় জানেন?”

“না।”

“কিন্তু এত দোকান থাকতে আপনার এই দোকানটার ওপর ওদের নজর কেন?”

“প্যাসেজটার লোভে। একবারে বাঁধের ধারে, তার ওপরে মেন রোডের বাঁকের মুখে। মাল এখানে রাখতেও সুবিধে, পাচার করতেও সুবিধে।”

“বুঝেছি। যাক, আজ যা হয়ে গেল তাতে আশা করি এর পরে আর ওরা আপনাকে জ্বালাতন করতে আসবে না। কেন না এতদিন চুপচাপে ছিল। এবার জানাজানি হয়ে গেল তো?”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে।”

“কালই ওদের ঘাঁটিটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।”

বাবলু চলে এল।

পরদিন সকালে হকার এসে খবরের কাগজটা দিয়ে যেতেই প্রথম পাতার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল বাবলু। উঃ! কী সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। কাগজের পাতায় ফটো সমেত বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে, 'গভীর রাতে দাশনগরের মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বেপরোয়া লরির ধাক্কায় একটি দোকান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দোকানের ভেতর দু'জন নিদ্রিত ব্যক্তির জীবনান্ত। লরিটিকে ধরতে পারা যায়নি।"—এই পর্যন্ত পড়েই বাবলু সোজা চলল থানায়। এ রকম ঘটনা যে ঘটবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

বাবলুকে দেখেই ওসি বললেন, "কী ব্যাপার। এমন সাত-সকালে?"

"স্যার, কাল যে দুর্ঘটনাটা হয়েছে তার লাশ কি এখনও আছে?

"কেন বলো তো?"

"একবার দেখব আমি কারা মরেছে!"

"তুমি চেন ওদের?"

"হ্যাঁ। অনুমান করছি। দোকানের মালিক, কারিগর আর একটা বয়কে নিয়ে দোকান। এই তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। দুজন মরেছে। একজন নিখোঁজ। দোকানের মালিকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। লাশদুটো মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। সত্যি, এ রকম অ্যাক্সিডেন্ট এ অঞ্চলে এর আগে আর কখনও হয়নি।"

"এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। হত্যা।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। ঘটনাটা যে এই দিকে টার্ন নেবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।"

"আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বাবলু তখন আগাগোড়া সব কথা খুঁটিয়ে বলল ওসি-কে। ওসি শুনে টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে বললে, "এঃ হে। কাল ধরেও ছেড়ে দিলে ব্যাটাদের। একবার আমাদের খবর দিলে না?"

"ইচ্ছে করেই দিইনি স্যার। কেন না ওদের আসল ঘাঁটি না জেনে ওদের ধরে ফেললে, মেরে শেষ করে দিলেও মুখ খুলত না ওরা। এখন জানাজানি যখন হয়ে গেছে তখন জাল গুটিয়ে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা। এই বার তো সুবিধে হবে ওদের বামালসমেত ধরবার।"

"তোমার কী দৃঢ় বিশ্বাস এই অ্যাকসিডেন্টটা ওরাই ঘটিয়েছে?"

"দৃঢ় বিশ্বাস। ওরা ছাড়া আর কেউ নয়। আমরা পুলিশে খবর দেব একথা ওদের শুনিয়েই দিয়েছি। তাই গায়ের জ্বালায় এখানে টোপ ফেলা সুবিধে হবে না বুঝে মরণ-কামড় দিয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে। তোমরা ভেতরে ভেতরে খবর লাগাও। আমিও কড়া নজর রাখছি চারদিকে।"

বাবলু থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই বিলুদের বাড়ি গেল। তারপর দলের প্রত্যেককে দুপুরবেলা যথাস্থানে জড়ো হতে বলে বাড়ি চলে এল।

দুপুরবেলা সবাই জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে। বাবলু বলল, "আজ রাত্রিবেলা সবাই কিন্তু আমাদের এই নতুন অভিযানের জন্য তৈরি থাকবি।"

"রাত্রি মানে বেশি রাত নয়। সন্ধের পরই। আমি ছদ্মবেশে রেল-বাঁধের উপর থাকব। তোরা থাকবি কাছাকাছি। আমার সংকেত পেলেই চলে আসবি।"

বিলু বলল, "ছদ্মবেশে কেন?"

"না হলে ধরা পড়বার ভয় আছে। যাক, আর একটু পরেই আমি ছেঁড়া কাগজ কুড়নেওয়ালার মেকাপ নিয়ে ওদের ঘাঁটিটা আবিষ্কার করতে যাব।

বিচ্ছুদের বাড়ি টেলিফোন আছে। তোরা সকলে একটু সতর্ক থাকবি। আমি যে কোনও সময়ে ফোন করতে পারি।”

ভোম্বল বলল, “তা হলে তুই কখন বেরোচ্ছিস?”

“এখনই। এই দেখ আমার পোশাক।”

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে কালি-ঝুলি মেখে চুল উশকো খুশকো করে ময়লা ছেড়া জামা পরে হাতে শিক আর পিঠে থলি নিয়ে একেবারে চমৎকার মেকাপ নিয়ে নিল।

তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামল বাবলু। ওর সঙ্গী পঞ্চুকে শুধু সঙ্গে নিল। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু প্রথমেই গেল ঘটনাস্থলে। একে মেলার ভিড়। তার উপর লোকজন হইহই করছে। কয়েকটা পুলিশ বসে বসে তাদের কর্তব্য পালন করছিল।

বাবলু এমনভাবে গেল যে তার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ। সে একমনে চারদিক লক্ষ করতে করতে পথ চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়েই দেখল একটা চওড়া রাস্তা সি টি আইয়ের দিকে বেঁকে গেছে। বাবলু সেই পথেই চলল। কেন না এদিকটা একদম ফাঁকা। আর যেদিকে ফাঁকা সেই দিকেই ধোঁকা। তা ছাড়া মস্তানদের পকেটের কাগজপত্তর দেখে ঘাঁটিটা যে এদিকেই তা ও অনুমান করেছে। খানিক আসতেই বাবলুর চোখে পড়ল কাঁচা পথের ওপর লরির চাকার দাগ। সেই দাগ ধরে ধরে খানিক যাবার পরই সে দেখতে পেল একটা মাঠের ওপর দিয়ে লরির চাকার দাগ সোজা চলে গেছে পশ্চিমে। বাবলু এদিক ওদিক তাকিয়ে নেমে পড়ল মাঠে। মাঠ পার হতেই একটা বুনো ঝোপের আড়ালে মস্ত একটা কারখানা ঘর দেখতে পেল। বহুদিনের পুরনো। সামনেট কারখানা। ভিতরে দোতলা বাড়ি। চারদিকের কম্পাউন্ড মস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লরির চাকার দাগটা সেই কারখানার গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেছে। মস্ত গেট। ভেতর থেকে বন্ধ।

বাবলু আর পঞ্চু আস্তে আস্তে সেই ঝোপের ভেতর ঢুকে কারখানার দিকে তাকিয়ে রইল। কারখানার ভেতরে কোনও কাজ হচ্ছে বলে মনে হল না। না হোক, ভিতর থেকে যখন বন্ধ তখন নিশ্চয়ই ভেতরে লোক আছে। আর সে লোক বেরোলে যেমন করেই হোক ওর ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে বাবলুকে। কাল মস্তান দুটোর প্যান্টের পকেট হাতড়ে এমন কিছু পায়নি বাবলু যাতে ওদের ঘাঁটিটাকে ও সহজেই আবিষ্কার করতে পারে। শুধুমাত্র দু-একটা চিঠির ওপর নির্ভর করেই এতটা এসেছে সে। এবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে ওর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল কিনা।

অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর বাবলু দেখল একজন নেপালি দারোয়ান গেট খুলে বাইরে এল। তারপর এদিক সেদিক একবার তাকিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই দুজন লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক। লোক দুজনও একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা পথ ধরে হাঁটা দিতে লাগল।

বাবলু ওদের চিনতে পারল না। শুধু ওর মনে এক অদম্য কৌতুহল হল, কারা এরা? এভাবে ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে কেন?

বাবলুর চোখের সামনে কারখানার গেট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বাবলু কারখানার ভেতরে ঢোকবার কোনও ফন্দিই আটতে পারল না। এর এই উঁচু পাচিল টপকানো তো একেবারেই অসম্ভব। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে তখন। তারপর আরও একটু অপেক্ষা করে সন্ধের গোড়ায় গোড়ায় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বাবলু। কারখানার গেটের কাছে গিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর সাহসে ভর করে গেটের ওপর টোকা দিল, টক টক টক।

অমনই গেট খুলে বেরিয়ে এল নেপালিটা।

“ক্যা মাংতা ?”

“ছেড়া কাগজ আছে তোমাদের? নিয়ে যাব।”

“কাগজ! নেহি হ্যায়। ভাগো হিয়াসে।”

“আরে ভাই ভাগে গা তো জরুর। বহুত পিয়াস লাগা হ্যায়। খোড়া পানি পিনে দো। কল কিধার?”

“কল উসতরফ । যাও, জলদি পি লো পানি।”

বাবলু ওর কাঁধের বস্তাটা নামিয়ে রেখে জল খেতে গেল। মনে মনে ভাবল ও জল খেতে গেলে নেপালিটা হয়তে ওর ঝুলি হাতড়ে দেখবে। কিন্তু না। তা সে করল না।

বাবলু জল খেয়ে আসতেই দারোয়ানটা বলল, “যাও ভাগো।”

বাবলু বলল, “আরে ভাই ভাগেগা তো। লেকিন একঠো বাত হ্যায়।”

“ক্যা বাত?”

“টেরিকটন কা প্যান্ট লেগা? কমতি দাম মিলেগা।”

“প্যান্ট! তুম তো কাগজ কুড়ানেবালে হো।”

“আরে বাবা টানা মাল। লেগা?”

“কাঁহা হ্যায়?”

“ঝুলি কা অন্দর।”

বলেই ঝুলির ভেতর থেকে কাল রাতের সেই মস্তানটার প্যান্ট বার করে দেখাল বাবলু

প্যান্ট দেখেই তো চক্ষু স্থির হয়ে গেল নেপালিটার। বলল, “এ। এ তুম কাহাসে লেয়ায়া?”

“এক দুকানকা বগলসে মিলা।”

“ইয়ে তো ছকুবাবুক প্যান্ট। কাল দো-চার লেড়ক ছকুবাবু ঔর মোনাবাবুক প্যান্ট লে লিয়া। আউর হ্যায়?”

“না ভাই। একঠো মিলা।”

“হু! ছকুবাবুক তবিয়ৎ আজ বহুত খারাপ হ্যায়। মু মে গরম পানি দে দিয়া ও লোক। বহুত জ্বলন হো রহা। ঠিক হ্যায়। তুম আও মেরা সাথ।”

উৎসাহে বাবলুর বুক ভরে উঠল। সে যে ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হল। নেপালিটার পিছু পিছু চলতে লাগল সে। যেতে যেতে দেখতে পেল কয়েকটা পুরনো জং ধরা জলের ট্যাঙ্ক পড়ে আছে এক পাশে। এক জায়গায় পড়ে আছে কতকগুলো শক্ত শনের দড়ি।

নেপালিটা ছিল আগে। বাবলু ছিল পিছনে। ওর সুবিধেই হল। তাই চট করে নেপালিটার নজর এড়িয়ে একটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ফাঁস তৈরি করে ফেলল সে। তারপর করল কী সেই ফাঁসটা পিছন থেকে টপ করে নেপালিটার গলায় পরিয়ে জোরে টান দিল।

এক টানেতেই চোখ-মুখ কপালে উঠে গেল নেপালিটার। সে না পারল চেঁচাতে, না পারল কিছু করতে। মুখ দিয়ে বুবু শব্দ করতে লাগল শুধু।

ততক্ষণে বাবলু ওর গুপ্তস্থান থেকে ছুরিটা বার করে তার পিঠে ঠেকিয়ে ধরেছে।

নেপালিটা একবার আড়চোখে দেখল বাবলুকে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না ওর।

বাবলু বলল, “এখন যা বলি তাই করো, যদি বাঁচতে চাও। ধস্তাধস্তি করলে বা চেঁচাবার চেষ্টা করলে দেখছ তো হাতে কী আছে? এখুনি গুজে দেব পেটের ভেতর। আর দড়ি তো আমার হাতেই। এমনই টান দেব যে দম আটকে মরবে।”

“বোলো ক্যা করনে হোগা?”

“ট্যাঙ্কের দিকে চলো।”

নেপালিটা একান্ত অনুগতর মতো সুড়সুড় করে সেই দিকে চলল।

ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে বাবলু বলল, “উঠো ই পর।”

নেপালিটা উঠল।

“অন্দর ঘুসো।”

তাই করল সে। নেমে পড়ল ট্যাঙ্কের ভেতর। নেমে বলল, “মেরা ক্যা কসুর?”

“তুমি দুশমনের লোক এই তোমার কসুর।”

“মুঝে ছোড় দো।”

“আগে আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দাও। তারপরে, ছাড়ব। ঠিক করে বলো এরা দলে কতজন আছে?”

“কারা?”

“এখানে যারা আছে তারা।”

“চারজন।”

“কে কে?”

“ছকুবাবু, মোনাবাবু, বিটুবাবু আর উৎপলবাবু।”

“কোথায় তারা?”

“ছকুবাবু, মোনাবাবু অন্দরমে হ্যায়। ঔর বিটুবাবু, উৎপলবাবু বাহারমে।”

“কখন ফিরবে তারা?”

“রাত্রি হবে।”

“ঠিক আছে। তুমি এর ভেতরে এখনকার মতো থাকো। পরে তোমাকে ছাড়া হবে।”

“বাবু, ইসকে অন্দরমে হাম মর যায়েঙ্গে। ঢাকনি খুল্লা রাখিয়ে।”

“না। ঢাকা দেব না, ভয় নেই। তোমাকে পাহারা দেবার লোক আছে আমার।” বলেই বাবলু গেটের দিকে তাকল।

পঞ্চু গেট পাহারা দিচ্ছিল তখন।

বাবলু ইশারা করতেই সে ছুটে এল।

বাবলু পঞ্চুকে ভেতরের বন্দি নেপালিটাকে দেখিয়ে বলল, "তুই একে পাহারা দে। আমি ততক্ষণে ব্যাটাদের দেখছি।"

পঞ্চু ট্যাঙ্কের ওপর বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল নেপালিটার দিকে। ভাবটা এই গোলমাল করেছ কী মরেছ।

সন্ধের অন্ধকার চারদিকে নেমে এসেছে তখন।

সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে এল বাবলু দোতলা বাড়িটার কাছে। অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ কোথাও নেই। সব বন্ধ। শিকল দেওয়া।

একটা ঘরের কাছে গিয়ে দেখল সেটা ভেতর থেকে বন্ধ হলেও জানলাটা খোলা। বাবলু উঁকি দিয়ে দেখল কালকের সেই মস্তানদুটো।

ভেতরে জোর তর্ক হচ্ছে দুজনের।

যার মুখে ফোসকা তারই নাম ছকু। সে বলছে, "বেশ করেছি। কী করে জানব যে ওরা ওরকম ড়েঞ্জারাস?"

"তোর জন্যেই তো সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।"

"সে-কথা বললে বলব দোষ তো তোরও। আমি তো তখনই বলেছিলুম সন্ধে রাতে এসব ঝামেলা না করে বেশি রাতে করাই ভাল।"

"হ্যাঁ, তা নইলে পুলিশের চোখে পড়বার সুবিধে হত কী করে? তুই কেন ছেলেগুলোকে ঘাটাতে গেলি? সব চাল ভেস্তে গেল আমাদের।"

"ও, সবই আমার দোষ। আমি বলেছিলুম লরির ধাক্কা দিয়ে দোকান ভেঙে লোক মারতে?"

"তা ছাড়া উপায় ছিল না। ছেলেগুলো পুলিশে খবর দিলেই পুলিশ এসে দোকানদারকে ধরত। কে জানে ওরা কোনওদিন চুপিচুপি আমাদের এই গোপন ঘাটির সন্ধান নিয়ে গেছে কি না?"

“শুধু সন্দেহের বশে ওই কাজ করে ফেললি?”

“তবে না তো কী? রাগ যখন চড়ে তখন কী কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকে! তবে দোকানের মালিক বৈকুণ্ঠবাবুকে আগেই গুম করেছি। ওকে তিল তিল করে মারব। ওই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। ব্যাটা আমাদের কথায় ভালয় ভালয় রাজি হয়ে গেলে কোনও কেলেংকারিই হত না।”

“কোথায় রেখেছিস তাকে?”

“নীচের তলায় দুনম্বর ঘরে। এখান থেকে যাবার আগে একটা বিষাক্ত ইঞ্জেকশান দিয়ে যাব ব্যাটাকে যাতে ওর সারা দেহ বিকৃত হয়ে যাবে। দন্ধে দগ্ধে মরবে ব্যাটা।”

“কাজটা খুব ভাল করিসনি। আমরা এতে আরও জড়িয়ে পড়লুম।”

“আরে, এটা যে আমরাই করেছি তার কী কোনও প্রমাণ আছে? কাগজে বেরিয়েছে এটা একটা বেপরোয়া লরির অ্যাকসিডেন্ট। যার কোনও হদিসও পাওয়া যাচ্ছে না।”

“কিন্তু আমাদের শত্রু সেই ছেলেগুলো যদি বলে, এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। তখন? ওরা পুলিশের স্পাই।”

“বয়েই গেল। আজ রাত্রেই তো আমরা কেটে পড়ছি।”

“মালপত্তর পাচার হয়ে গেছে?”

“সব। টাকা-কড়িও আদায় হয়ে গেছে। এবারে আমরা একেবারে ঝাড়া হাত পা।”

“টিকিট কাটা হয়েছে?”

“কাটতে গেছে। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন। এখনও সাতটা বাজেনি। তবে তুই কিন্তু আজকে যাবি না। যতক্ষণ না মুখটা সারে ততক্ষণ ঘর থেকে বেরোবি না।”

“ভাগাভাগি পরে হবে।”

“ওসব শুনছি না। আমার টাকা আমাকে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাবে তোমরা।”

“তুই সে কথা বলবি উৎপলবাবুকে। তোর টাকা চেয়ে নিবি।”

“কত টাকা হয়েছে মোট?”

“দুলাখ।”

“বলিস কীরে?”

“আরও হত। তাড়াতাড়ি ছিল, তাই আধামূল্যে দিতে হয়েছে সব।”

“কোথায় আছে টাকাগুলো?”

“পাশের ঘরে।”

“চাবি কার কাছে?”

“চাবি উৎপলবাবুর কাছে।”

ছকু হঠাৎ বলে উঠল, “ওদের আসতে নিশ্চয়ই দেরি হবে? ততক্ষণে তালাটা ভেঙে বখরাটা আমাদের দু'জনের মধ্যেই করে নিলে হয় না?”

“আবার বদ বুদ্ধি চাপছে তোর মাথায়?”

“ভেবে দেখ, একেবারে হাফ-হাফ।”

এবার খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল অপর জন। যার নাম মোনা। বলল, “সত্যি বলছি, এ মতলব যে আমারও ছিল না তা নয়। আমি যে তোলা ভাঙতে পারি না। পাছে তুই বেগড়বাই করিস তাই তা ছাড়া বাহাদুর রয়েছে গেটে।”

ছকু বলল, “ওরে সামান্য একটা পেরেক যদি হাতে পাই আমি তা হলে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মার তৈরি তালাও

ভেঙে দিতে পারি। এ তালা তো কোন ছার। না হলে অমন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের তালা ভেঙে আমি পালিয়ে আসি?”

“না না। এখনই চল।”

বাবলু চট করে জানলার ধার থেকে অন্ধকার ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। দুই মস্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একবার এদিক-সেদিক চেয়ে দেখল। তারপর কী একটা জিনিস দিয়ে খুট-খাট করেই খুলে ফেলল পাশের ঘরের তালা। ঘরের ভেতর ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখা গেল একটা তক্তপোশের ওপর বড় একটা চামড়ার সুটকেস বসানো রয়েছে। সম্ভবত, এর ভেতরেই রয়েছে টাকা।

ছকু বলল, "মোনা, তুই একবার নীচে যা। যেমন করেই হোক বাহাদুরকে কোথাও সরিয়ে দে। আর অমনি দেখে আয় বিটুবাবু উৎপলবাবু আসছে কি না।"

মোনা বলল, "বাহাদুরটাকে একেবারে জন্মের মতো শেষ করে দিলে হয় না?"

"না। তাতে আরও খারাপ হবে।"

মোনা তরতরিয়ে নীচে চলে গেল।

আর ছকু পাশের ঘরে চলে গেল জামা-প্যান্ট ছাড়তে।

বাবলু এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল সব। এবার দেখল চমৎকার একটা সুযোগ। সে করল কী চোখের পলকে সেই সুটকেশটা নিয়ে তরতরিয়ে ছাদে উঠে গেল। তারপর একটা দড়িতে সুটকেশের হাতলটা বেঁধে ছাদের কার্নিশে একটা হুকের সঙ্গে আটকে ছাদের বাইরে ঝুলিয়ে দিল। যাতে ছাদে উঠলেও সুটকেশটা কেউ দেখতে না পায়। দিয়ে যথাস্থানে ফিরে এল।

একটু পরেই শোনা গেল ছকুর গলা, "মোনা! মোনা রে!"

গেটের কাছ থেকে উত্তর এল, "কী?"

"শিগগির আয়। সর্বনাশ হয়েছে।"

মোনা ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এল, "কী হয়েছে?"

বাবলু তখন বেশ একটু নিরাপদ দূরত্বে অন্ধকারে বসে মজা দেখছে ওদের। এবার আর ওর হাতে ছুরি নয়। একটু উঁচু ধরনের জিনিস, পিস্তল।

ছকু বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। টাকা উধাও।"

“হোয়াট?”

“সব টাকা উধাও।”

“তার মানে?”

“কিছুই বুঝতে পারছি না রে!”

“শিগগির বল কোথায় লুকিয়েছিস টাকা?”

“সত্যি বলছি, জানি না। তোর গা ছুয়ে বলছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“দেখ ছকু, আমার সঙ্গে ধান্দাবাজি করিস না। আমাকে ধাপ্পা দিবি তুই? একটি গুলিতে সাবাড় করে দেব এখনই। এখনও বল কোথায় লুকিয়েছিস? বিশ্বাসঘাতকতা করিস না।”

“কী আশ্চর্য! তুই আমি তো এক সঙ্গে দরজা খুলেছি। তারপর তুই নীচে গেলি। আমি প্যান্ট ছাড়তে পাশের ঘরে গেলাম। এর মধ্যে এসে দেখি সুটকেস উধাও।”

“তোর চালাকি আমি বুঝি না মনে করেছিস? নীচে গিয়ে দেখলুম বাহাদুর নেই। গেট খোলা। তার মানে এ সবই তোর ষড়যন্ত্র। আগে থেকে তুই বাহাদুরকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলি। তারপর আমাকে লোভ দেখিয়ে আমার সাহায্যে তালা ভেঙে আমাকে নীচে পাঠিয়ে সেই তালে মাল পাচার করিয়েছিস। আবার ন্যাকামো করে আমাকে ডেকে ওপরে এনে ওর পালাবার পথও পরিষ্কার করে দিলি। কিছু বুঝি না আমি, না?”

মোনা তখন সজোরে ছকুর পেটে একটা ঘুষি মেরে দিয়েছে, “ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক। বল, টাকা কোথায়?”

ছকু কাতরে উঠে বলল, “জানি না।”

“জানিস না?” বলেই আবার একটা ঘুষি ছকুছিটকে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। সেখান থেকে কলার ধরে মোনা তাকে টেনে নিয়ে এল। তারপর আবার একটা ঘুষি।

ছকু নেতিয়ে পড়ল।

মোনা তখন দুহাতে ওর গলা টিপে একেবারে শেষ করে দিল ওকে। তারপর পাগলের মতো এ-ঘর সে-ঘর নীচে-ওপর করতে লাগল টাকার জন্য। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল।

ততক্ষণে বিটুবাবু উৎপলবাবুও এসে পড়েছেন।

“কী ব্যাপার?”

“সর্বনাশ হয়েছে।”

“তার মানে?”

“এই ব্যাটা ছকুটা বেইমানি করে সব টাকা পাচার করে দিয়েছে।”

বিটুবাবু উৎপলবাবুও চিৎকার করে উঠলেন, “এ হতে পারে না।”

“কিন্তু হয়েছে।”

বিটুবাবু বললেন, “তা, তুমি কী করছিলে?”

“আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ওস্তাদ।”

উৎপলবাবু বললেন, “কিন্তু আমি যদি বলি টাকা তুমিই সরিয়েছ? ও তোমাকে বাধা দিতে গিয়েছিল বলে ওকে শেষ করে তুমি পালাচ্ছিলে?”

“না না। আপনি বিশ্বাস করুন।”

“ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক। বল, টাকা কোথায়?”

“সত্যি বলছি, আমি জানি না।”

“বাহাদুর কোথায়? বাহাদুর নীচে নেই কেন? দরজা কেন খোলা?”

“আমি তো সেই জন্যেই মারলুম ছকুকে।”

“আমিও তা হলে সেইজন্যেই তোকে মারি।” বলেই রিভলভার উঁচিয়ে ধরলেন উৎপলবাবু।

ততক্ষণে মোনা উৎপলবাবুর হাতের কবজি লক্ষ্য করে একটা ঘুষি ছুড়ে দিয়েছে।

সেই প্রবল ঘুষিতে উৎপলবাবুর হাতের রিভলভার ছিটকে গিয়ে বারান্দার বাইরে পড়ল। বিটুবাবু তখন চেপে ধরেছেন মোনাকে।

মোনা নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বিটুবাবুর পেটে জোড়া পায়ে একটা লাথি বসিয়ে সরে এল।

উৎপলবাবু তখন বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়েছেন মোনার ওপর। মোনাকে শুইয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মোনার সঙ্গে কখনও তিনি পেরে ওঠেন? মোনা পাদুটো গুটিয়ে বুকের কাছে এনে সজোরে উৎপলবাবুর বুকে ধাক্কা দিল।

উৎপলবাবু একেবারে ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন ঘরের ভেতর।

সেই ফাঁকে মোনাও লাফিয়ে উঠে বিটুবাবুর কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঢোকাল ঘরের ভেতর।

বিটুবাবুও সুযোগ পেয়ে দুমদাম লাথি, ঘুষি ছোটাতে লাগলেন মোনার বুকে পেটে।

বাবলু তো এই তালই খুঁজছিল। ওরা তিনজনে যখন ঘরের ভেতর ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে ও চুপি চুপি এসে দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল।

দরজা বন্ধ হতেই মারামারি ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল তিনজনে। “কে? বাইরে কে? দরজা বন্ধ করল কে? দরজা খোলো।”

বাবলু জানলার কাছে গিয়ে বলল, “দরজা পুলিশ এসে খুলবে।”

উৎপলবাবু বললেন, “কে তুই?”

বাবলু বলল, “আচ্ছা গুড নাইট। আপনারা একটু শান্ত হন। আমি ততক্ষণে আপনাদের শ্রীঘরে যাবার ব্যবস্থাটা করে আসি।”

ঘরের ভেতর সবাই হতভম্ব হয়ে রইল।

বাবলু নেমে এল নীচে। বৈকুণ্ঠবাবুকে উদ্ধার করতে হবে।

দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল বাবলু। তারপর দুনম্বর ঘরের শিকল খুলতেই দেখতে পেল ঘরের মেঝেয় হাত-পা বাধা বৈকুণ্ঠবাবু পড়ে আছেন।

ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল বাবলু।

তারপর বৈকুণ্ঠবাবুকে মুক্ত করল।

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বললেন, “তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে?”

“যে করেই আসি সে আপনার জানবার দরকার নেই। এখন যা বলি আপনাকে, তাই করুন।”

“কী করতে হবে বলো?”

“আপনি এখনই থানায় চলে যান। যাবার সময় দাশনগর স্টেশনের কাছে আমার দলের ছেলেরা আছে, তাদের খবর দিন। দেরি করবেন না, যান।”

“কিন্তু আমি যে কোথায় আছি তার কিছুই জানি না?”

“আপনি দাশনগরের খুব কাছেই আছেন। এই বাড়ির বাইরে যে মাঠ রয়েছে সেটা পেরোলেই সি টি আই-এর রাস্তা। তারপরেই দাশনগর। যান, তাড়াতাড়ি যান।”

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, “ওঃ, খুব বঁচিয়েছ বাবা এ যাত্রা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তা পথে কোনও ভয় নেই তো?”

“না। সব কটাকে আটকেছি। আপনি নির্ভয়ে যান।”

বৈকুণ্ঠবাবু চলে গেলেন।

বাবলু ততক্ষণে ছাদে গিয়ে সেই সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে এসে বারান্দায় রাখল।

তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দেখতে পেল দুটো ভ্যান বোঝাই পুলিশ নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু ফিরে আসছেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তাদের সঙ্গে আছে।

বাবলু প্রথমেই বাহাদুরকে গ্রেফতার করতে বলল। কেন না সে কিছু করুক না করুক দলের লোক তো বটে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, তুমি যে ফোন করবে বলেছিলে, কই ফোন করলে না তো?"

"ফোন করবার মতো অবস্থা ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "তা কী করে কী করলি রে তুই? তুই তো দেখছি একাই একশো।"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল ওদের।

পুলিশ অফিসার বললেন, "কই, সেই কালপ্রিটগুলো কোথায়?"

বাবলু বলল, "ওপরে আছে।"

পুলিশের লোকেরা ওপরে উঠে বিটুবাবু, উৎপলবাবু আর মোনাকে গ্রেপ্তার করল।

সুটকেশ ভর্তি কালো টাকাও জমা পড়ল পুলিশের হাতে।

পুলিশ অফিসার বাবলুর বুদ্ধি ও সাহসের খুব প্রশংসা করলেন।

বাবলু বলল, "সবের মূলে কিন্তু পঞ্চু, আমাদের এই কুকুরটা। কেন না, ও যদি না বাহাদুরকে পাহারা দিত তা হলে আমি কোনও মতেই এদের কায়দা করতে পারতাম না।

পুলিশ অফিসার বললেন—"থ্যাঙ্ক য়ু মি. পঞ্চু।"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

পুলিশের গাড়িতে করেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে যার বাড়িতে ফিরে এল।

বাড়িতে ঢোকার আগেই বাবলু শূন্যে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুও আনন্দে চেচিয়ে উঠল, ভৌ। ভৌ ভোঁ।"